পাতালছায়া

নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

টিমটিমে একটা আলো জ্বলছে ঘরে। একধারে পুরোনো তক্তপোষ। ময়লা চাদর পাতা। পাতলা ও তেল - চিটচিটে একটা বালিশ। এটাই মেজকাকার ঘর এবং বিছানা।

কলকাতা থেকে অনেক দূরে, পাড়াগাঁয়ে, চারপাশের টিনের আর টালির কালের বাড়িগুলোর মাঝে বেশ বেমানান এই দোতলা বাড়িটাতে অনেক ঘর। সব ঘরই বেশ বড়সড়, খোলামেলা। এই বাড়িটিই নাকি ঋচিকের বাবার, মনে ঋচিকেরও 'বাস্তভিটা'। কিন্তু এতবড় বাড়িতে সকলের থাকার আলাদা ঘর আছে। বড়সড়, সাজানো - গোছানো ঘরই। শুধু মেজকাকারই জায়গা হয়েছে একতলায়, —সিঁড়ির নিচে, অন্ধকার এবং ঘুপচি একটা ঘরে। ব্যবস্থাটা ঋচিকের ভাল লাগেনি। কিন্তু সে কী করবে? সে তো বারো বছরের বালক মাত্র। মেজকাকার ঘর নিয়ে সে যদি আপত্তি জানাতে যায় তার কথা শুনছেটা কে?

এখন রাত কত হবে? অনেক রাত। দোতালার একটা ঘরে, খাটের নরম বিছানায়, নীল মশারির ভেতরে কখন ঋচিককে শুইয়ে দিয়ে গেছে মা। অন্ধকার ঘরে একা শুতে ভয় করে ঋচিকের। তাই গল্প পাওয়ারের আলোটা জ্বলছে। ওরা, —মানে, মা-বাবা, ছোটকাকা আর কাকিমা নিশ্চিত ধরে নিয়েছে ঋচিক এখন ঘুমিয়ে কাদা। কিন্তু ঋচিক তো ঘুমোয়নি। সে আঁচ করেছে আজ কিছু একটা হবে বাড়িতে। এরা সবাই মিলে হয়ত মারবে মেজকাকাকে। কেন মারবে? ঋচিক ওদের আলোচনা থেকে কিছুটা বুঝেছে। সবটা বোঝেনি। কী সব সম্পত্তিটম্পত্তির কথা বলছিল বাবা। সই দিতে হবে মেজকাকাকে। সই দিতে যদি না চায়, তাহলে জোর খাটাবে ওরা মেজকাকার ওপর। ওদের কথাবার্তা থেকে ঋচিক একটু অন্তত বুঝেছে। আর বুঝেছে বলেই সে শুধু ভাবছে মেজকাকাকে নিয়ে।...আহা রে রোগাপটকা, বেচারা মেজকাকা! বাঘের থাবার মতন বাহার হাতে একটা চড় খেলে মেজকাকা হয়ত উল্টে পড়েই যাবে।

নীল মশারির ভেতর শুয়ে ঋচিক মোটেই ঘুমোয়নি। কিংবা বলা যায় ঘুমোতে পারেনি। মা তাকে শুইয়ে দিয়ে চলে যাবার অনেক পরে ঋচিক মশারি থেকে বাইরে বেরিয়ে এসেছে। সিঁড়ির আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনছে ওদের শলা - পরামর্শ।

—মেজদার ওপর জোর খাটিয়ে কাজ হবে বলে মনে হচ্ছে না দাদা। —বলল ছোটকাকা। —ওকে আরও একটু বোঝাবার চেষ্টা করলে কেমন হয়?

—আর কত বোঝাব? —বাবা বলল। —পাগল মানুষকে তুই কী বোঝাবি? কতবার বোঝাবি? আজ সকালে তুই আর আমি তো অনেক বোঝাবার চেষ্টা করলাম। বুঝলি কিছু? ফ্যালফ্যাল করে শুধু তাকিয়ে রইল। একেবারে হোপলেস।

—অতবড় একটা মানুষের ওপর জোর খাটানো যায় নাকি?—এবার কথা বলছিল মা। —তাও মানুষটা যদি সুস্থ সবল হত। ...নাহ বাপু মারধর করার দরকার নেই। নিজের খেয়ালে যদি এগ্রিমেন্টের কাগজে সই দিতে পারে তো দিক। তা না হলে প্রোমোটারকে বলে দাও না যে এখন এ বাড়ি বেচবে না। বাড়ি তো আমাদের একার নয়। তিন ভাইয়ের সম্পত্তি দলিল সেভাবেই করা আছে। দুজন একমত হলে তোমরা। কিন্তু মেজদার মত যদি না পাওয়া যায় তাহলে কীভাবে বেচবে পিতৃপুরুষের ভিটে?

—এটা তুমি ঠিক বললে না দিদি। —ঋচিকের ছোটকাকিমা এবার যে ফুঁসে উঠেছিল। —তোমরা তো বেশ কলকাতায় সেটল্ করে গেছ। আর আমরা কী চিরকাল এই অজ পাড়াগাঁতেই পড়ে থাকব? এই ভাঙা চোরা, সাপখোপের বাড়ি আর ঐ ধুমসো পাগলকে নিয়েই কী আমাদের দিন কাটবে? আমাদের কোনও সাধ-আল্লাদ নেই বুঝি? সামনের বছর মেয়েটার ক্লাশ ফাইভ হবে। কত দিনের ইচ্ছে ওকে কলকাতার কোনও ইংলিশ মিডিয়াম ইস্কুলে পড়াব।

মা বলল— তোমরা একাই যে ঐ পাগলকে সামলাচ্ছো তা তো নয়? কলকাতা থেকে আমরাও তো মাঝে মাঝে ওর মেনটেনান্সের জন্য দেড় হাজার টাকা পাঠাই।

—রাগ কোরো না দিদি। —ছোটকাকিমার সুর নরম— প্রোমোটারকে বাড়িটা বেচে দেওয়ার সুযোগও তো তোমাদের জন্যেই পাওয়া গেছে। সেটা কী কেউ অস্বীকার করবে? বড়দা এই খোঁজটা না আনলে—

হ্যাঁ। সুযোগটা ভালই জুটে গেছে কী বসিল দিব্য?—এবার কথা বলছিল বাবাণ—আসলে গ্রামে আমাদের এই বাড়িটার লোকেশানও বেশ পছন্দ হয়ে গেছে প্রোমোটার খেমকার। আর দুদিন বাদে এসব ধানজমি সব উবে যাবে। ওয়াল্ড ব্যাঙ্কের টাকায় পি.ডব্লিউ.ডি. দুশ ফিট চওড়া রাস্তা বানাচ্ছে। সেই বাংলাদেশের বর্ডার পর্যন্ত যাবে। আর আমাদের এই বাড়ি থাকবে নাকি? প্রোমোটার বাড়ি ভেঙে ফেলে নিশ্চয়ই শপিং -মল বানাবে। কিংবা ছোটখাটো হোটেল জাতীয় কিছু একটা হাইওয়ের ধারে শপিং-মল বা হোটেল যাই করুক খদ্দেরের অভাব হবে না। সাথে কী ও বালো লাখ টাকা দিতে রাজি হয়েছে? সেই বারো লাখ টাকা তিনভাগ হবে। আমি কাউকে ঠকাতে চাইনা। অভি পাগল হলেও ও চারলাখ পাবে। আমার দুজনে চার লাখ করে।

পাগল মানুষ অত টাকা নিয়ে কী করবে?—কাকিমার প্রশ্ন।

— ব্যাঙ্কে ওর নামে ফিকস্ড ডিপোজিট করতে হবে। লোকাল গার্জেন কাউকে একটা করতে হবে। কিংবা আর একটা কাজ করা যায়?—বাবা থামল। কিছু যেন চিন্তা করছিল।

—আবার কী করবে? —ছোটকাকে জিজ্ঞেস করল।

—রাঁচির পাগলা - গারদে অভিকে চালান করে দেওয়া উচিত হবে না। হাজার হোক সহোদর ভাই। একেবারে খোঁজ পাব না সেটা কী হয়? সাউথ চব্বিশ পরগণাতে ডায়মণ্ড হারবার রোডের ধারেই একটা বড় এন.জি.ও অ্যাবনরমাল মানুষদের রি-হ্যাবিলিটেট করার জন্যে বোধহয় একটা হোম - টোম করেছে। সেখানে অভিকে রাখা যেতে পারে। মাসে মাসে টাকা লাগবে ওর অ্যাকাউন্ট থেকে যাবে।

—এটা তুমি খুব ভাল ভেবেছ দাদা। —ছোটকাকার উচ্ছ্বসিত স্বর। —আমি অনেকদিন আগেই গড়িয়ার দিকে একটা

জমি কিনে রেখেছি সেটা তো তোমরা জানো। এই ভিটে বিক্রি করে গেলে যা টাকা পাব আমি তা দিয়ে বাড়িটা তুলব ঠিক করেছি।। তখন আর মেঝদাকে পুষতে পারব না।

—ম্যাগো! মাঝে মাঝে বিছানায় পায়খানা করে ফেলে পাগলটা!—বলছিল কাকিমা।—তখন সেই নোংরা পরিষ্কার করা যে কী হ্যাপা!...

—আরে নাহ। ঐ পাগলকে কেউ বাড়িতে রাখে? প্রথমে ভেবেছিলাম বয়স বাড়লে হয়ত অ্যাবনরমালিটি চলে যাবে। কিন্তু কোথায় কী? যত দিন যাচ্ছে অভী আরও ডিটেরিয়েট করছে। তাই না। দিব্য?

—হ্যাঁ তাই তো। এই তো আজ সকালবেলা তুমি আর আমি কত করে মেজদাকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম।...যে, কোর্টের এগ্রিমেন্টে সইটা দিয়ে দাও তাহলে টাকা পাবে। কিন্তু শুনল? তুমি বল? যতক্ষণ আমরা বোঝালাম জুলজুল করে তাকিয়ে থাকল। তারপর বলে কিনা সই-টই আমি দিতে পারব না। ওসব সব তোমাদের বুজরুকি। আমাকে পথে বসাবার মতলব।...তাই না দাদা?

—হ্যাঁ। —ঋচিকের বাবা বলল। —শালা অভীটাকে বোঝা শক্ত। মাঝে মাঝে মনে হয় ও ঠিক পাগল নয়। সব বুঝছে। সব বুঝতে পারছে। ওর কপালটাই খারাপ। অথচ এই অভীই আমাদের তিন ভাইয়ের মধ্যে সবথেকে ব্রিলিয়ান্ট ছিল।

—মেজদা তো ডাক্তারি পড়তে মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছিল —তাই না? এই প্রশ্নটা ঋচিকের মায়ের।

—হ্যাঁ। খুব স্যাড ব্যাপার। —বাবা বলছিল। —দিব্য তখন অনেক ছোট। ওর হয়ত ঠিক মনে নেই। ...এম.বি.বি.এস. পড়তে গিয়ে অভীর সর্বনাশটা হল। শুনেছিলাম ওর ক্লাশ মেট একটা মেয়ের প্রেমের পড়ে গিয়েছিল অভী। খুব ডাকসাইটে সুন্দরী ছিল নাকি মেয়েটা। অভীর মাথা একেবারে ঘুরে গিয়েছিল। কিন্তু মেয়েটা শুনেছি নর্থ ক্যালকাটার খুব বড়লোকের বাড়ির মেয়ে। আর অভী তো চেহারা-ছবিতে একটা গেঁয়ো ভূত। সে কখনও অভীকে পাত্তা দ্যায়? অভীকে রিফিউজ করেছিল মেয়েটা! তার সঙ্গে বন্ধুবান্ধবদের সামনে নাকি অপমানও করেছিল। ক্লাশে ঢুকলেই টিটকিরি শুনতে হত অভীকে। ক্রমশ ওর মাথাটা যেন খারাপ হয়ে গেল। একদিন হোস্টেল ছেড়ে চলে এল বাড়িতে। তখন ওর মেডিকেল থার্ড ইয়ার চলছে। কিন্তু কিছুতেই আর কলেজে গেল না। সবসময় এই বাড়িতে বসে থাকত ঘরের দরজাতে খিল এঁটে।...অনেকদিনের কথা। তবুও আজও স্পষ্ট মনে আছে। একদিন অনেক বেলা হয়ে গেল। তাও ঘরের দরজা খুলছিল না অভী। বাবা মা আমরা বাড়িশুদ্ধ সবাই চিন্তায় পড়ে গেলাম। তারপর জোর করে দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে দেখি ঘরে সিলিঙে গামছা আটকে নিজের গলায় পরাতে যাচ্ছে।

—ও মা গো! কী কাণ্ড! —ঋচিকের মা অস্ফুটে বলল।

—তাড়াতাড়ি আমরা দৌড়ে গিয়ে ওকে ধরলাম। কথাবার্তা বলে বুঝলাম ওর মাথা ঠিকঠাক কাজ করছে না। তারপর থেকেই ওরকম অ্যাবনরমাল হয়ে গেল। পড়াশোনা ছেড়ে দিল। তারপর ডাক্তার বদ্যি দ্যাখানো হল। ওকে সুস্থ করার জন্যে অনেক কাঠখড় পুড়িয়েছিল বাবা। কিন্তু অভী আর ভাল হল না। একটা বার্ডেন হয়ে বসে রইল বাড়িতে।

একতলার ঢাকা দালানে বহুক্ষণ ওদের বাবা, মা, কাকা আর কাকিদের আলোচনা চলছে। দোতলার সিঁড়িতে আড়ালে দাঁড়িয়ে ঋচিক চুপিচুপি শুনছে। অনেকক্ষণ ঠাই দাঁড়িএয় থেকে ঋচিকের পাদুটো ধরে গেছে। এখন কত রাত। এখন তো ঋচিকের ঘুমিয়ে পড়ার কথা। কিন্তু কী করে ঘুমোবে ঋচিক? মেজকাকার জন্যে তার ভয়ানক চিন্তা হচ্ছে। ছোটকাকা হাই তুলে বলল—দাদা এসব পুরোনো কাসুন্দি আর ভাল লাগছে না। চল দেখি মেজদার ঘরে।

বাবা বলল— চল। হারামজাদা কী এখনও জেগে আছে? হয়ত ঘুমে গাদা। আমি ভাবছি এত রাতে ঘুম থেকে টেনে তুলে জোর খাটাতে গেলে পাগলটা যদি চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে দ্যায়?

কাকা বলল—এছাড়া উপায়ই বা কী? গভীর রাত ছাড়া এসব কাজ হয়? অন্য সময় তো এ বাড়ি লোকজন, চাকরবাকরে ভর্তি। তাদের সামনে ওসব সই-টই নিয়ে জোরাজুরি করতে গেলে সারা গাঁয়ের মানুষ জেনে যাবে। তখন রটবে যে সম্পত্তি আমরা ভাগ - বাঁটোয়ারা করে নিচ্ছি মেজদাকে বঞ্চিত করে। সে আর এক কেলেঙ্কারি। সকলকে ডেকে ডেকে তো সব বোঝানো যাবে না। কাকিমা বলল - চিৎকার চেঁচামেচি আবার কী করবে? আমরা, আমি আর দিদি দরকার হলে ওর মুখে কাপড় বেঁধে দেব।

ঋচিকের মা বলল—ওমা? আমি ওসব পারব না। তারপর যদি কামড়ে টামড়ে দ্যায়?

বাবা বলল—তোমাদের কাউকে কিছু করতে হবে না। যা করবার আমি করব। এখন চল দেখি অভীর ঘরে...।

।। দুই।।

গতকাল ঋচিক এসেছে এ বাড়িতে বাবা-মায়ের সঙ্গে। অনেক বছর বাদে। আগে একবার এসেছিল। তখন ঋচিক পাঁচ বছরের শিশু। কিছুই তার মনে নেই। তারপর আর আসেনি। মাঝে মাঝে বাবা আসে এই গ্রামে, বাস্তুভিটেয়। এখন ঋচিকের স্কুলে সামার ভেকেশন চলছে। তাই মা বলল যে, চল আমরাও ও বাড়িতে দুদিনের জন্যে ঘুরে আসি। এখানে এসে ঋচিক অবশ্য বুঝে গেছে যে, নেহাত বেড়াতে আসেনি বাবা। একটা উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে। ...প্রোমোটার... বাড়ি বিক্রি কীসব আলোচনা করছে ওরা গতকাল থেকেই।

মেজকাকা লোকটাকে এরা পাগল বলে। কিন্তু ঋচিক দুদিন ধরে দেখছে তাকে। কোথায় পাগল বলে মনে হয়নি তো। তাকে তাড়াও করেনি। আচঁড়ে - কামড়েও দ্যায়নি। বরং তাকে তীরধনুক বানিয়ে দিয়েছে। লোকটাকে প্রথম দর্শনে অবশ্য কীরকম ভয় হয়েছিল ঋচিকের। মুখময় কাঁচা-পাঁকা দাড়ি-গোঁফ। পরনে নোংরা পাজামা আর ছেঁড়া গেঞ্জি। আজ সকালে মেজকাকার ঘরের সামনে দিয়ে যখন যাচ্ছিল ঋচিক তখনও ডাকল তাকে।

—এ্যাই খোকা?—ডেকেছিল মেজকাকা। —তোর নাম কী রে?

—ঋচিক।

—পাখির ছানা নিবি?

— কি পাখি?

—বুলবুলি...টুনটুনি যা চাইবি ধরে দেব।

—টুনটুনি পাখি নেব। —ঋচিক বলেছিল।

—কোথায় রাখবি? —প্রশ্ন করেছিল মেজকাকা।

—কেন ? খাঁচায়?

—আকাশে উড়ছিল একটা পাখি। তাকে খাঁচায় পুরে দিবি? কি দোষ করেছে সে? এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারেনি ঋচিক। তার মনে হয়েছিল লোকটা সত্যিই পাগল। তারপর মেজকাকা জিজ্ঞেস করেছিল—তুই কার ছেলে রে? ঐ মোটা মতন লোকটা যে গাড়ি নিয়ে এসেছে?

—হ্যাঁ। আমার বাবা। ...আমরা কলকাতায় থাকি।

—কলকাতা? ...সেখানে কি আছে? ...নদীর ওপর একটা ব্রিজ আছে। আর ঘোড়ার ডিম আছে? —কথাটা বলে খুব খুক করে হাসছিল মেজকাকা।

—এখন একটা ব্রিজ নয়...নদীর ওপর দুটো ব্রিজ আছে।

—বলেছিল ঋচিক।

—হুঁ। —হঠাৎ কীরকম গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল মেজকাকা। বিড়বিড় করেছিল নিজের মনে — খোকাটারে কি দেওয়া যায়? কি দেওয়া যায়? —তারপর জিজ্ঞেস করেছিল ঋচিককে—তীর ধনুক নিবি?

সত্যিই কঞ্চি, সুতো, আটা আর রাংতা দিয়ে মেজকাকা ঋচিককে তীর - ধনুক বানিয়ে দিয়েছিল।

।। তিন।।

সিঁড়ির নীচে চানঘরের দরজার কাছে দাঁড়ালো মেজকাকার ঘরটা পুরো নজরে আসছে। জায়গাটা অন্ধকার। ঋচিককে কেউ দেখতে পাবে না। কিন্তু ঋচিক সকলকে দেখতে পাচ্ছে। নোংরা বিছানা - বালিশ আর জড়ো করে রাখা মশারির মাঝখানে মেজকাকা বসে আছে। মশারি টাঙানো ছিল। বাবা একটান মেরে মশারি তুলে দিয়েছে। মেজকাকা বসে আছে। চোখে মুখে ভয়। ঝুলজুল করে দেখছে সবাইকে। মেজকাকার ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে আছে বাবা। ঘরের দরজার কাছে মা, কাকা, কাকিমা।

একটা কাগজ বাড়িয়ে ধরেছে বাবা মেজকাকার দিকে। ঋচিক জানে ওখানে সই দিতে হবে মেজকাকাকে। এটা নাকি আদালতের কাগজ। আদালত জায়গাটা কিরকম? সেখানে কি হয়?

—অভী এখানে সই কর। এটা এফিডেবিটের কাগজ। স্ট্যাম্প পেপার। ...দু - জায়গায় সই দিতে হবে। এই নে কলম সই কর।

মেজকাকা চুপ করে বসে আছে। জুলজুল করে তাকাচ্ছে বাবার দিকে।

—নে সই কর। —বাবা আবার বলল।

মেজকাকা চুপ করে বসে আছে। একই ভাবে তাকাচ্ছে সকলের দিকে।

—সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না মনে হচ্ছে। —কাকিমা বলল।

হঠাৎ মেজকাকা হাত বাড়িয়ে কাগজটা নিল। তারপর দলা পাগিয়ে সেটা ছুঁড়ে দিল ঘরের মেজেতে।

কাকা বলল— দেখলে দাদা? দেখলে? বলেছিলাম না?

ঋচিক দেখছে, বাবার ফর্সা মুখ লাল হয়ে উঠেছে রাগে। বাবার চোখ দিয়ে আগুন বের হচ্ছে। বাবা মেজকাকার চুলের ঝুঁটি ধরে এক থাপ্পর কষাল। হাঁফাতে হাঁফাতে বলছিল—সই করবি না তুই? তোর ঘাড় করবে। শালা সেয়ানা পাগল! আরও মারছিল বাবা মেজকাকাকে। ঋচিকের খুব কষ্ট হচ্ছিল। মেজকাকা মার খেয়ে চিৎকার করেনি। কীরকম কুঁকড়ে যাচ্ছিল। আর গোঙানির মতন আওয়াজ বের হচ্ছিল মেজকাকার মুখ দিয়ে।

মা বলল—অত মেরো না। এবার দ্যাখো না। যদি সই করে। কাকা বলল—মেজদা হ'ল শক্তের ভক্ত। আমি জানি। কাকিমা বলল —রোজদিন পাগলের সঙ্গে এই কেলেঙ্কারি ভাল লাগে না...। বাবা মেজকাকাকে বলল—সই তোকে করতেই হবে। তুই সব বুঝিস। দলা-পাকানো কাগজটা ঠিকঠাক করেছে কাকা মেঝে থেকে তুলে নেওয়ার পর। তারপর আবার মেজকাকার সামনে বাড়িয়ে দিল। বাবা কলম ধরিয়ে দিয়েছে মেজকাকার হাতে। —সই দে। ...যাহোক হিজিবিজি একটা সই দে। তাতেই হবে। উকিল ঠিক ম্যাজিস্ট্রেটকে কনভিনস করবে। ঋচিকের বলতে ইচ্ছে করছিল—সই দিয়ে না মেজকাকা! সই দিয়ো না। এই লোকগুলো খুব খারাপ। খুব স্বার্থপর...!

কিন্তু মুখ দিয়ে কোন আওয়াজই বের হল না ঋচিকের। সে শুধু দেখছিল কলম দিয়ে কী যেন লিখছে মেজকাকা কাগজটাতে।

তারপর বাবা সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল—সই করেছে!

কাকা, কাকিমা, মা সবাই বলছিল—সই করেছে? যাক বাবা। ভালোয় ভালোয় মিটল ব্যাপারটা...।

।। চার।।

—ঋচিক! এই ঋচিক! ...কোথায় যে গেল ছেলেটা? এই কখন দুধ গরম করেছি। এবার ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। —মা ঢুকল দোতলার ঘরে। সেখানে ঋচিকের বাবা, কাকা আর একটা লোক সোফাতে বসে কথা বলছে। তিনজনের হাতে সিগারেট। এই

লোকটা হল মিঃ খেমকা। সেই প্রোমোটার। যে এই পুরোনো বাড়ি বারো লাখ টাকায় কিনবে।

—ছেলেটাকে দেখেছ? —মা জিজ্ঞেস করল বাবাকে।

—এ ঘরে? না তো? —বাবা বলল।

—দেখ মাঠে - ঘাটে কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। কলকাতায় তো এত মাঠ-ঘাট নেই। —হেসে কাকা বলল।

ঋচিক ঋচিক ঋচিক। মা ডেকেই যাচ্ছে। সব ঘর দেখা হল। কোথায় ঋচিক? তাহলে কি বাইরে চলে গেল? সকালের দুধ-বিস্কুট না খেয়ে?

—কি হয়েছে দিদি? ছেলেকে খুঁজছ? —ছোটকাকিমা জিজ্ঞেস করল। খুব সকালে তার চান সারা হয়ে যায়। পরনে ম্যাক্সি। চুল টেনে বাঁধা। ঠোঁটে লিপস্টিক। বাড়িতেও ছোটকাকিমা খুব সেজে থাকতে পছন্দ করে।

—কোথায় চলে গেল বল তো ছেলেটা? এখনও দুধ খায়নি।

—পাগলের ঘরে দেখেছ? —ছোটকাকিমা বলল।—

—পাগলের ঘরে? সেখানে যাবে?

—তোমার ছেলের সঙ্গে এই দুদিনেই পাগলটার বেশ ভাব হয়ে গেছে।

সিঁড়ির নিচে আদো - অন্ধকার, ঘুপচি ঘরটাতে উঁকি দিয়ে মা দেখল পাগল মানুষটা উপুড় হয়ে শুয়ে আছে বিছানায়। আর ঋচিক ওর মাথার চুলে, ঘাড়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

—ঋচিক!...কি করছিস এখানে? এখনও দুধ খাসনি?

—ঋচিক চোখ তুলে তাকায়। মা দেখে-জলে টলটল করছে ছেলের দুই চোখ।

—কাঁদছ নে?—মা জিজ্ঞেস করে। — কি হয়েছে তোমার?

—তোমরা এত খারাপ কেন গো মা? —জল ভরা চোখে ঋচিক প্রশ্ন করে। —তোমরা সবাই খুব খারাপ। খুব খারাপ। বাবা, কাকা, কাকিমা, তুমি - তোমরা সবাই খারাপ ... নিষ্ঠুর। বাবা কাল রাতে কি মারই না মারল মেজকাকাকে! খুব লেগেছে মেজকাকার ... খুব লেগেছে...

গুমরে গুমরে কাঁদছিল ঋচিক। খুব কাঁদছিল...।